চিন্তা

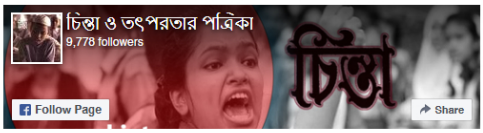

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও হেগেল

ফরহাদ মজহার || Thursday 25 July 24 || **বিষয় অনুসারে পড়ুন :** সাম্প্রতিক রাজনীতি

Great revolutions which strike the eye at a glance must have been preceded by a quiet and secret revolution in the spirit of the age (Zeitgeist), a revolution not visible to every eye, especially imperceptible to contemporaries, and as hard to discern as to describe in words. It is lack of acquaintance with this spiritual revolution which makes the resulting changes astonishing.

HEGEL

১

বাংলাদেশে একটা অদ্ভুত ধারণা রয়েছে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে চিন্তার কোন যোগ নাই। একটি সমাজ যখন তাদের অবস্থা সম্পর্কে নানান দিক থেকে ভাবতে ও বিচার করতে শেখে তার প্রভাব সরাসরি রাজনীতিতে পড়তে থাকে। সজীব ও সক্রিয় চিন্তা ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই আন্তঃসম্পর্ক বাংলাদেশে সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশে অবশ্য 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'বুদ্ধিজীবী' জাতীয় কিছু শব্দের প্রচলন আছে। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় বুদ্ধিজীবীরাই চিন্তা করে। এটাও ভুল ধারনা। অনুমান হচ্ছে যারা পত্রপত্রিকায় লেখালিখি করে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, কিম্বা লেখক হিশাবে পরিচিত -- তারাই 'বুদ্ধিজীবী'। অর্থাৎ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীতার কাজ হচ্ছে লেখালিখি করা, পত্রিকায় কলাম লেখা, জনগণকে উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি। সে কারণে যারা সক্রিয় রাজনীতি বলতে রাস্তায় মিছিল-মিটিং করা বোঝেন, তারা প্রায়ই কটাক্ষ করে বলেন, রাস্তায় নামুন, লেখালিখি করে কোন লাভ নাই। এতে বোঝা যায় রাজনীতিতে সজীব ও সক্রিয় চিন্তার ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সমাজে ধারণা নিকৃষ্ট। রাজনীতিওয়ালাদের কাছে চিন্তাশীল লেখালিখি তাই সহজে কটাক্ষের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার অর্থ ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে পড়া। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হয়ে ওঠে। রাজনীতি এক ধরণের 'কাল্ট" হয়ে ওঠে। রাজনীতি হয়ে ওঠে যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের যে কোন মূল্যে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে নিজেরা ক্ষমতায় বসার কর্মকাণ্ড। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের বাইরেও রাজনীতির ময়দানে অনেক দুঃসাধ্য ও সাহসী কাজ জনগণ করে, কিন্তু আমরা কি চাই এবং যা চাই তাকে বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল কি হতে পারে – সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চিন্তার অভাবের কারণে বাংলাদেশ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক ভাবে স্থবির হয়ে আছে। সমাজের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত নানাভাবে সমাজ নিয়ে ভাববার, সংস্কারের বা গঠনের প্রণোদনা দিলেও চিন্তাশীলতার প্রতি আমাদের অনীহা মারাত্মক ভাবে রাজনৈতিক পরিসরে আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। আমরা বারবার হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে পড়ছি।

অন্তঃসারশূন্য নির্বাচনের দাবি ছাড়া ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাই কোন প্রতিরোধ বা শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। সেটা আদৌ তাদের পক্ষে সম্ভব কিনা সেটা চিন্তার বিষয়; কারণ চিন্তাশীলতার অভাবই একটি রাজনৈতিক দলেরও ক্ষয়ের প্রধান কারণ। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে ভর করতে হচ্ছে রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের ওপর। কিছু কিছু নতুন ও ছোট রাজনৈতিক দলগুলোকে বিদেশ নির্ভর হতেও দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ওপর বিরোধী দলগুলো ভর করছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা দুই হাজার আঠারো সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আমরা যেমন দেখেছি, দ্বিতীয়বারের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময়ও আমরা তা দেখছি। তাই যখনই কোন ইস্যুতে সমাজে গণবিক্ষোভ বা গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজনীতি দলগুলো তার ওপর সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে আন্দোলনের সম্ভাব্য ইতিবাচক ফলকে লক্ষ্যচ্যুত হয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট শক্তি গণ আন্দোলনের বিভিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের দায়ভাগ বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে

দেবার চেষ্টা করে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে স্বাধীন ভাবে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে অগ্রসর হতে চাইছে। আমাদের উচিত তরুণদের এই নীতি ও কৌশলকে সমর্থন করা। এই আন্দোলনের নীতিগত দিক জনগণের কাছে পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে 'মুক্তিযোদ্ধা' নামক কোন সামাজিক বর্গ তৈরি করে চাকুরী কিম্বা সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির বিধান নাই। তাই 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা' একটি অসাংবিধানিক নির্বাহী সিদ্ধান্ত। ছাত্রছাত্রীরা একটি অসাংবিধানিক নির্বাহী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়ছে যে সিদ্ধান্ত সমাজে বৈষম্য তৈরি করে।

সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনের জন্য জনগণ ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করে, দাবি দাওয়া তোলে। দাবিদাওয়ার সুনির্দিষ্ট বা 'বিশেষ' হলেও যে কোন ইতিবাচক দাবিদাওয়ার সার্বজনীন মর্ম থাকে। সমাজের চিন্তাশীল অংশের কাজ হচ্ছে গণ দাবিদাওয়ার সার্বজনীন মর্ম সবার সামনে তুলে ধরা। সমাজের চিন্তাশীল ও সংবেদনশীল তরুণদের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল উন্মেষে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

আশা করি সমাজে সজীব ও সক্রিয় চিন্তা কিভাবে রাজনীতি ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে আমরা আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারব।

২

চিন্তা বুদ্ধিজীবীদের একচেটিয়া নয়। সামাজিক বাস্তবতা নানান ভাবে সমাজের চিন্তাচেতনার মধ্যে হাজির থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বা একাডেমিক জ্ঞানচর্চার জগতে তাই নৃতত্ত্ব – বিশেষত Cultural Anthropology-র বিশেষ স্বীকৃতি আছে, বিশেষ স্থানও বরাদ্দ রয়েছে। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হচ্ছে সমাজের চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান ও উপলব্ধিকে শনাক্ত ও লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা।

বলাবাহুল্য ছাপাখানা বা গুটেনবার্গ টেকনোলজির যুগে লেখালিখি, ছাপা এবং তার প্রচার সক্রিয় ও সজীব চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ফলে সজীব চিন্তা সম্পন্ন ছাপা বই মানবেতিহাসে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। সজীব ও সক্রিয় চিন্তা বলতে বোঝান হয় যে সকল বই আমাদের প্রথাগত বদ্ধমূল অনুমানকে প্রশ্ন করে, আমাদের নতুন ভাবে ভাবতে বাধ্য করে এবং বিদ্যমান দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও সংকট মীমাংসার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো আমাদের ধরিয়ে দেয়। পাশ্চাত্যে চিন্তার যে বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গে ছাপাখানা ও বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রচার আর প্রোপাগান্ডামূলক লেখার সঙ্গে চিন্তাশীল লেখার ফারাকও এখানে। চিন্তাশীল রচনার আবেদন আমাদের চিন্তাশীলতার শক্তি বৃদ্ধির প্রতি নিবেদিত থাকে। কোন একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত, মত বা মতবাদ প্রচার তার উদ্দেশ্য থাকে না। বরং বাস্তব সমস্যা সমাধানের বাধা হিশাবে যে সকল দিক, গ্রন্থি বা গিঁট চিন্তা টের পায় তার মীমাংসা ছাড়া সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। চিন্তাশীল রচনা সেই গিঁটগুলো ভাঙে, এবং নতুন করে চিন্তা করবার ক্ষেত্র প্রদর্শন করে। যে সকল বিষয় আগে আমাদের নজরের বাইরে ছিল, তারা সহজে দৃশ্যমান হয়। আমরা বিভিন্ন গুরুতর বিষয় নিয়ে ভাবতে পারি এবং নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান ভেবে বের করতে পারি।

প্রচার ও প্রপাগাণ্ডামূলক সাহিত্য মানেই মন্দ এটা ভাববারও কোন কারণ নাই। কারন নতুন চিন্তা বা আদর্শ সমাজে প্রচার ও প্রপাগান্ডার মধ্য দিয়েই ছড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, লেনিন পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারকে বিপ্লবী মতাদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হবার উপায় হিশাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সজীব ও সক্রিয় চিন্তার বিপরীতে প্রচার ও প্রপাগান্ডামূলক সাহিত্য একটা সময় চিন্তার বিকাশের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন চিন্তাকে সজীব ও সক্রিয় নয়, বরং বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে সজীব ও সক্রিয় চিন্তা দমন করাই প্রচার ও প্রপাগান্ডার কাজ হয়ে ওঠে। প্রোপাগান্ডা বিশেষ কোন গোষ্ঠি বা পক্ষের সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

সজীব ও সক্রিয় চিন্তার চরিত্র বুঝলে আমরা একই সঙ্গে বুঝি যে একটি দেশের জাতীয় রাজনীতি আসলে সমাজের বিদ্যমান চিন্তা থেকে আলাদা কিছু না। অর্থাৎ সংবিধান, ক্ষমতা, রাষ্ট্র, রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, জাতির পিতামাতা, সমাজ, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সমাজের চিন্তা যে স্তরে থাকে আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও সেই স্তরেই বিরাজ করে। তাহলে বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমরা যদি কোন পরিবর্তন চাই তাহলে এই গোড়ার বিষয়গুলোকে কঠোর পর্যালোচনা বা চিন্তার অধীনে আনবার শিক্ষা আমাদের অর্জন করতেই হবে। গোড়ার দিক স্পষ্ট না হলে আন্দোলন-সংগ্রামে অকাতরে প্রাণহানি ঘটবে, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে আমরা কিছুই অর্জন করতে পারবো না, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ পেয়ে আঞ্চলিক কিম্বা আন্তর্জাতিক পরাশক্তি আমাদের ঘাড়ের ওপর আরও চেপে বসবে।

তরুণরা বাংলাদেশে যখন দ্বিতীয়বার কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে তখন তাদের দাবিদাওয়া শিক্ষার্থীদের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও জাতীয় রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে তার সীমাবদ্ধতা সহজেই চোখে পড়ে। কোটা সংস্কার আন্দোলন তরুণদের সম্পর্কে একটা বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরি করে। সেটা হোল তারা আমলা বা সরকারি চাকুরীজীবী হতে চায়। বাংলাদেশে আমলা শ্রেণী সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক। ফলে একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের দুর্নীতিবাজ আমলা হতে চাওয়ার মধ্যে গৌরবের কিছু নাই। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির দুরবস্থা ও বেকারত্ব বিচার করলে তরুণদের দিক থেকে কোটা সংস্কার ন্যায়সঙ্গত দাবি। তবে কোটা সংস্কার আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা মূলত বাংলাদেশে এমন এক আমলা শ্রেণী ও সরকারি কর্মকর্তা তৈরির কারখানা যার দ্বারা বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তি নিজের ক্ষমতা পোক্ত করে এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থায়িত্ব দীর্ঘস্থায়ী করে।

আন্দোলন শুরুর পরপরই তরুণ শিক্ষার্থীরা এটা বুঝতে পারে। তারা একে স্রেফ কোটা সংস্কার বা চাকুরী পাওয়ার আন্দোলন হিশাবে হাজির করে নি। এই ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাশীলতা এবং দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়। তারা একে নাম দিয়েছে 'বৈষম্য বিরোধী' আন্দোলন। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের সীমিত চরিত্রকে সহজে একটি সার্বজনীন চরিত্র দান করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে অতি দ্রুত তা জনপ্রিয় আন্দোলনে রূপ নিতে পেরেছে। শুধু সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন লাভে শেষ হয় নি, সমাজের সাধারণ মানুষের সমর্থনও লাভ করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দাবি সর্বস্তরে বৈষ্যম্যের বিরুদ্ধে লড়াই। 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা'র নামে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বৈষম্য হয়ে উঠেছে সাধারণ ভাবে ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈষম্য জারি রাখার নীতি। এ যাবতকাল ক্ষমতা ও সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনরা সমাজে যে বিপুল বৈষম্য তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে সমাজে বিপুল ক্ষোভ রয়েছে। ফলে তরুণদের বৈষম্যবিরোধী লড়াই সাধারণ ভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের সঙ্গে সহজে যুক্ত হতে পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বৈষম্য তৈরির মানদণ্ড বা পদ্ধতি হিশাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হাতে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য তৈরির প্রধান হাতিয়ার। বাহাত্তর সাল থেকে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধকে সমাজে বিভেদ তৈরি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতার পক্ষে ন্যায্যতা তৈরি এবং ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করবার কাজে ব্যবহার করছে। ফলে বৈষম্যের বিরোধিতা শুধু সরকারি চাকুরীতে কোটার

বৈষম্য নয়, সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের সমাজের সকল স্তরে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্লোগান হয়ে উঠতে পেরেছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করবার একটি কারণ বৈষম্য সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সে কারণে অনায়াসেই বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই হিশাবে গড়ে উঠতে পেরেছে। সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

৩

লিখতে পারাই চিন্তা করতে পারা নয়। লিখলেই বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। সজীব ও সক্রিয় চিন্তা সম্পুর্ণ ভিন্ন একটি চর্চা। চিন্তা শুধু স্বাক্ষর মানুষ বা তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী করে তা নয়। চিন্তা মানুষের স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তি। তাই চিন্তার শক্তি স্বাক্ষর বা শিক্ষিতদের লেখালিখিতেই শুধু আমরা পাব সেটা মোটেও ঠিক না। তার আদৌ কোন গ্যারান্টি নাই। দ্বিতীয়ত শুধু জাগতিক নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধির ক্ষমতা জনগণের মধ্যেও থাকে। কালভেদে বা যুগভেদে সেখানে পার্থক্য ঘটে অবশ্যই, কিন্তু প্রতিটি যুগ বা কাল জনগণের চিন্তাচেতনার মধ্যেও বিভিন্ন রূপে হাজির থাকে। তাকে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত করবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, আন্দোলন বা সংগ্রামে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বোঝে যে তথাকথিত নির্বাচন বাংলাদেশের বিদ্যমান সমস্যা ও সংকটের কোন সমাধান করতে পারবে না। ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামকে কিভাবে গণক্ষমতায় এবং গণক্ষমতাকে কিভাবে নতুন ভাবে বাংলাদেশ 'গঠন'করবার রাজনীতিতে পরিণত করা যায় – সেটাই জনগণের দিক থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান বিচার্য বিষয়। বিরোধী দল এই দিকটিকে বারবার উপেক্ষা করেছে, নিজেদের সম্পর্কে তারা এই ধারণাই দিয়েছে যে তারা বিদ্যমান ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায়। রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় জনগণ হতাশ হয়েছে।

কিন্তু যখনই জনগণ তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করবার সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি টের পেয়েছে তারা কাতারে কাতারে রাস্তায় বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট দ্বিতীয়বারের মতো কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সফল করেছে। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং কিশোর কিশোরী ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সেই সময় থেকেই এটা পরিষ্কার যে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা এবং ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের বিরোধ বা দ্বন্দ্বই সাধারণ মানুষের কাছে প্রধান জাতীয় রাজনীতির বিষয়। অতএব দল নিরপেক্ষ বা বিশেষ ভাবে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো থেকে মুক্ত ও স্বাধীন যে কোন আন্দোলনে জনগণ সায় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক ঘাটতি সম্পর্কে সতর্কতা জরুরি। কোন কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সংস্থা বা চিন্তাশীল স্বাধীন রাজনৈতিক ধারা তরুণরা গড়ে তুলতে না পারলে তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং তা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকা উচিত নয়। যদি তাই হয় তাহলে তরুণদের কাজ হচ্ছে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করতে শেখা এবং সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনকে কিভাবে জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ও সজ্ঞান করে তোলা যায় সেই দিকে মনোযোগী হওয়া।

কোন সমাজের পক্ষেই তাদের বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব, দৈনন্দিন সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে ভাবনা এবং তার মীমাংসা না করে টিকে থাকা সম্ভব না। যারা বাংলাদেশে চিন্তা চর্চায় অক্ষম এবং তার মর্ম বুঝতেও অক্ষম তাদের দাবি হচ্ছে ধরো তক্তা মারো পেরেক জাতীয়। তাদের রাজনীতিও সেই রকম। তাদের ধারণা রাস্তায় সস্তা স্লোগান ও জ্বালাও পোড়াও জাতীয় অনর্থক সহিংস কর্মকাণ্ড করলেই ক্ষমতার বদল হয় কিম্বা সমাজ বদলে যায়। কিম্বা নিজের দলকে ক্ষমতায় বসানো যায়। তারা আসলেই বোকার স্বর্গে বাস করেন। সবচেয়ে ভয়ানক বিপদ হচ্ছে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজে সাধারণ ভাবে জনগণের চেতনায় যে গুণগত রূপান্তর ঘটে, তারা সেই প্রক্রিয়ার বিকাশে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন। সজীব ও সক্রিয় চিন্তা এবং মতাদর্শিক লড়াই ছাড়া কোন সমাজের পক্ষেই মৌলিক কোন রাজনৈতিক রূপান্তর সম্ভব না।

সজীব ও সক্রিয় চিন্তা এবং বিপ্লব সম্পর্কে জর্মন দার্শনিক হেগেলের একটি চমৎকার কথা আছে। বড় বড় বিপ্লব আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়, আকস্মিক আমাদের বিস্মিত ও হতবাক করে। কিন্তু এ ঘটনা ঘটবার আগে সমাজের মধ্যে নিঃশব্দে এবং গোপনে একেকটা কালের চিত্ত ও চিন্তাবৃত্তির মধ্যে আগেই বিপ্লব ঘটে যায়, যা সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। সজীব ও সক্রিয় চিন্তা কিম্বা চিত্ত ও চিন্তাবৃত্তির রূপান্তরের কথা পাশ্চাত্য দর্শনে যেভাবে SPIRIT (GEIST) দিয়ে বোঝানো যায় বাংলা ভাষায় তাকে সেভাবে বোঝানো যায় না। 'স্পিরিট' কথাটাকে 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় না। মনের হিম্মত বা শক্তি এবং তার রূপান্তর প্রক্রিয়া জাগতিকতারও রূপান্তর। মানুষের মন বাস্তব জগত থেকে আলাদা কোন পরিমণ্ডল নয়। মনের রূপান্তর যেমন জাগতিকতার রূপ বদলের শর্ত তৈরি করে, তেমনি জাগতিকতাও আমাদের মনের রূপে বদল ঘটায়। মনের এই বদল হেগেল দাবি করেছেন সাধারণত সমসাময়িক কালে যারা বাস করেন তাদের কাছেও অধরা থেকে যায়। ফলে বাস্তবে যখন বিপুল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হাজির হয় তখন তারা যারপরনাই বিস্মিত বোধ করেন।

বাংলাদেশের গণমানসে এবং চিন্তার পরিমণ্ডলে এক এগারোর (২০০৭) পর থেকে একটা বড়সড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সেই পরিবর্তন ধরবার চেষ্টা আমাদের সমাজে ছিল না বললেই চলে। শেখ হাসিনার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিবাদের ফ্যাসিস্ট রূপ নতুন রূপ নিয়ে হাজির হয়। শেখ হাসিনা সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক ভাবে আরও পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন। ক্ষমতা সাংবিধানিক ভাবেই আগে এক ব্যাক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফ্যাসিস্ট শক্তিও সার্বভৌম ক্ষমতা হিশাবে শেখ হাসিনার হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিশাবে শেখ হাসিনা ডিজিটাল সিকিউরিটি এক্ট প্রণয়ন করেন। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও ডিজিটাল সিকিউরিটি এক্ট প্রত্যাহার করা হয় নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভ সে কারণে একটু সুযোগ পেলেই ফেটে বেরিয়ে পড়ে। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখনই তাকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন হিশাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে জনগণ বিপুল ভাবে সাড়া দিয়েছে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে তা একটি বিপ্লবী গণ অভ্যুত্থান। এর পরিণতি কি ঘটবে আমরা এখনো জানি না। কিন্তু নিঃসন্দেহে সজীব ও সক্রিয় চিন্তার ক্ষমতাকে উপেক্ষা করলে আমরা ঘোর উদ্দেশ্যহীনতায় খাবি খাব। আমরা যারা যখন গণ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম, তখন অনেকে হেসেছেন, কিম্বা এড়িয়ে গিয়েছেন। চোখ বন্ধ রাখলে অবশ্য প্রলয় বন্ধ থাকে না। হেগেল ঠিকই বলেছেন, বড় বড় বিপ্লব আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়, আকস্মিক আমাদের বিস্মিত ও হতবাক করে। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটবার আগে সমাজের মধ্যে নিঃশব্দে এবং গোপনে একেকটা কালের চিত্ত ও চিন্তাবৃত্তির মধ্যে আগেই বিপ্লব ঘটে যায়, যা সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলাদেশে তরুণদের চিন্তায় নতুন উপাদান ও গভীরতা অনেকে এখনও টের পান নি। এটা মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার, প্রগতিশীল বনাম প্রতিক্রিয়াশীল, বাম কিম্বা ডান, ইসলাম বনাম ধর্ম নিরপেক্ষতা, আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি-জামাত ইত্যাদি প্রাচীন, অন্তঃসারশূন্য ও বালখিল্য বাইনারি দিয়ে বোঝা যাবে না। এটা ফ্যাসিস্ট

শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের অভ্যুত্থান। এই রক্তক্ষয় বাংলাদেশকে নতুন ভাবে গঠন করবার জন্য। হেগেল ঠিকই বলেছেন – প্রস্তুতি দীর্ঘকাল ধরেই চলতে থাকে, কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু যখন ঘটে তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

ছাপবার জন্য এখানে ক্লিক করুন

৫০০০ বর্ণের অধিক মন্তব্যে ব্যবহার করবেন না।

1 comment Sort by Oldest

Add a comment...

Rokon Uddin

SURPRISEABE ARTICALE

Like · Reply · 1 · 8w

Facebook Comments Plugin

Copyright © Your Website 2016